দৈনিক বাংলা

তারিখ ২২।২।৮৩
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...



# আমার স্মৃতিতে '৫২-র একুশে ফেব্রুয়ারী

আজকের হিসেবে তখন অনেক ছোট ছিলুম। খাস দেহাত থেকে রাজধানীতে আনকোরা আমদানী। জগন্নাথ কলেজে ফার্স্ট ইয়ার আর্টসের ছাত্র। তো রাজধানীতে বসবাসের ব্যবস্থা হলেও রাজনীতির সাথে কোনো যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু গড়ে উঠতে দেরী হয়নি। লিয়াকত আলী খান সাহেব খুন হবার পর তার পরিত্যক্ত গদীতে বসলেন তখনকার বড়লাট নাজিম-উদ্দীন সাহেব। জন্মসূত্রে তিনি বাংলাদেশী, তবে কখনোই বঙ্গভাষী ছিলেন না; বাংলা ভাষার উপর দরদের প্রশ্ন ওঠে না। আর সেই সময় বাঙ্গালীদের খাঁটি পাকিস্তানী ও মুসলমান বানাবার উদ্দেশ্যে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা বানাবার চক্রান্ত চলছে, চলছে বাংলাকে আরবী হরফে লেখানোর পাঁয়তারা।

'৪৮ সালেই জিন্নাহ সাহেব উর্দুকে পাকিস্তানের একমেবা-দ্বিতীয়ম রাষ্ট্রভাষা বানাবার অভিলাষ প্রকাশ করেছিলেন। এদেশের মানুষ জানিয়েছিল প্রচন্ড প্রতিবাদ। ৫১-তে নাজিমউদ্দীন সাহেব ঢাকায় এসে একই খায়েশ ব্যক্ত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল এদেশের মানুষ। সেই গর্জনে আমিও মিলিয়েছিলুম আমার ক্ষীণকণ্ঠ।

আজ ঊনত্রিশ বছর পরে স্মৃতি অনেক ঝাপসা হয়ে গেছে; সেদিন যারা আমার চারদিকে ছিলেন: লড়াই করেছিলেন মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য; দুরন্ত আবেগে যারা ফুঁসে উঠেছিলেন তাদের সবাইকে এখন মনে পড়ে না; অনেক ঘটনা স্মৃতি থেকে একেবারেই মুছে গেছে। শুধু এটুকু মনে আছে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার সংগ্রামে জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা গ্রহণ করেছিল এক উদ্দীপিত ভূমিকা। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে এরা কেউ ছিল না, তাদের উপর কেউ দায়িত্ব চাপিয়েও দেয়নি, কিন্তু তারা সবাই মায়ের ভাষা কেড়ে নেবার ষড়যন্ত্র রুখতে নিয়েছিল বজ্রশপথ।

এখনো কিছু কিছু চেহারা ভেসে ওঠে। আনিসুজ্জামান অর্থাৎ ডঃ আনিসুজ্জামান, এখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক, নেয়ামাল বাসির (জাতীয় সংসদের একজন কর্মকর্তা), আহমদ হোসেন সৈয়দ, বাংলাদেশ জাতিসংঘ সমিতির সম্পাদক, আবদুর রহিম বাংলাদেশ অবজারভার-এর বার্তা সম্পাদক, আমীর আলী (লন্ডন প্রবাসী), শফিউদ্দিন আহমদ (বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির সাবেক সভাপতি) ছিলেন আমার সহপাঠী। আর আমরা সবাই গভীর আন্তরিকতায় ভাষা আন্দোলনে শরীক হয়েছিলুম। আমাদের এক ধাপ উঁচু ক্লাসে ছিলেন: এহসানুল হক ভুঁইয়া কণা (বর্তমানে টিভি অভিনেতা), আনোয়ারুল আজিম (বিমান-এ কর্মরত), আবদুল কুদ্দুস (ওয়াপদাতে কর্মরত)। এরা ছাড়া আরো অনেকে ছিলেন যারা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন ভাষা আন্দোলনে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে এরা কেউ ছিলেন না বলে ভাষা আন্দোলনে এদের অবদান ইতিহাসে থাকবে না কিন্তু আমি তো দেখেছি জগন্নাথ কলেজকে কেন্দ্র করে যে এলাকা সেই গোটা এলাকার কি গভীর নিষ্ঠা নিয়ে এরা একুশে ফেব্রুয়ারীর জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন। মাতৃভাষাকে মর্যাদাদানের সংগ্রামের এরা সবাই ছিলেন অকুতোভয় সৈনিক। ২০-এর রাতে জারি হল ১৪৪ ধারা। জগন্নাথ কলেজের হোস্টেলে ঢুকে পুলিশ গ্রেফতার করল নেয়ামাল বাসিরকে। সে তখন পোস্টার লিখছিল। হাতেনাতে গ্রেফতার। সে খবর জানলুম ২১শে ফেব্রুয়ারী সকালে কলেজে পা দিয়ে।

একটা অনুভূতি খুব প্রবল ছিল। যে ভাষায় কথা বলেছি, বলব আমার ভাইবোন বোনেরা, দেশের কোটি কোটি মানুষ কথা বলে যে ভাষায়, সেই ভাষা, আর যা কিনা তখনকার সংখ্যাগুরুদের ভাষা, তাকে অবহেলা করা হবে........আর অন্য একটা ভাষা চাপিয়ে দেয়া হবে এটা ছিল আমাদের কাছে অসহ্য। আর তাই আমরা একযোগে মাতৃভাষার মর্যাদা তুলে ধরবার লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। গোটা দেশের মানুষ জেগে উঠেছিল, অদেয় চেতনায় ছিল মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালবাসা, ভাষার প্রতি সম্মানবোধে তারা হয়ে উঠেছিল উদ্বেল। প্রতিটি মানুষ যেন পরিণত হয়েছিল অগ্নিশিখায়। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল ইস্পাতকঠিন চেতনা নিয়ে।

সব পথ সেদিন ধাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে (পুরনো বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন, এখন যেখানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের এমার্জেন্সী বিভাগ অবস্থিত)। ১৪৪ ধারা ছিল, কিন্তু তবু রাজপথে নেমেছিল মানুষের ঢল। ছোট ছোট গ্রুপে ভাগ হয়ে আমরা যখন সকাল দশটার দিকে সেখানে পৌঁছুলুম তখন গোটা তল্লাট পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। আর ভিতর থেকে ভেসে আসছে শ্লোগানের পর শ্লোগান। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা তখন উত্তাল।

শুরু হল আমতলায় সর্বদলীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভাষা সংগ্রাম কমিটির সভা। তাতেই প্রস্তাব নেয়া হল: ১৪৪ ধারা ভাঙ্গতে হবে। দশবারোজন করে গ্রুপে গ্রুপে ছাত্ররা বেরিয়ে যাবে প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের দিকে। তখন পরিষদের অধিবেশন চলছিল।

বাধা এসেছিল। সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে এসেছিলেন এক ভদ্রলোক। পরে শুনেছিলুম তার নাম শামসুল হক; সেকালের আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী। তিনি বললেন, সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার বিপক্ষে।

ক্ষেপে গেল ছাত্ররা। কে যেন তার দিকে থুথু দিয়েছিল বলে শুনেছি। বক্তৃতা করছিলেন এক ভদ্রলোক। দীঘল চেহারা; বুলন্দ কণ্ঠস্বর, রাঙ্গা বরণ, তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন অসহ্য আবেগে। পরে জেনেছিলুম তার নাম গাজীউল হক: খুব বড় একজন ছাত্রনেতা। সভার সময় শ্লোগানে শ্লোগানে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা বার বার প্রকম্পিত হতে লাগল।

দশ-বারোজনের মিছিল একের পর এক বেরোতে লাগল। প্রথম দিকে যারা বেরিয়েছিল শুনেছিলুম তাদের কাউকে গ্রেফতার করে কারাগারে নেয়া হয়েছে। কিন্তু একের পর এক মিছিল বেরোতে দেখে পুলিশ লাঠিচার্জ করতে লাগল। তার জবাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের ভিতর থেকে তাদের উপর বর্ষিত হতে থাকল ইস্টক বৃষ্টি।

একটু পরেই শুরু হল কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণের ভিতরে, ওদিকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ভিতরে। বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে গেল। কারণ এত লাঠিচার্জ আর কাঁদানে গ্যাস উপেক্ষা করেই ছেলেমেয়েরা মিছিল করে বেরিয়ে যেতে লাগল। আমাদের তখন সময়জ্ঞান নেই। আমরা তখন ক্ষিপ্ত। আমাদের স্নায়ুতে তখন বজ্রের গর্জন; তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মেঘডম্বরু। কখন যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে মেডিক্যাল কলেজের গেটে গিয়েছি মিছিল করে সে সময়টার কথা মনে নেই। এদিকে তখন কিছুটা শান্ত। কেননা, পুলিশ তখন তদানীন্তন প্রাদেশিক পরিষদ (বর্তমানে জগন্নাথ হল) আর মেডিক্যাল কলেজের মাঝামাঝি, মেডিক্যাল কলেজের ভিতর থেকে আসছে শ্লোগানের বজ্রনিনাদ আর তারা তখন উত্যক্ত করে চলেছে পুলিশদের।

মেডিক্যাল কলেজের ভিতরে ঢুকলুম। টিয়ার গ্যাসের জ্বালায় দু'চোখ জ্বলছে। কে একজন চোখে ঔষধ লাগিয়ে দিলেন। বাইরে একের পর এক শব্দে ফাটছে টিয়ার গ্যাস। এই সময় দৌড়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন শিল্পী মুর্তাজা বশীর। তিনি তখন আর্টস স্কুলের ছাত্র। চীৎকার করে বললেন, পুলিশ গুলি চালিয়েছে। আমার সামনে খুন ঝরেছে। বাইরে দাঁড়ানো মোটেও নিরাপদ নয়। শীগগীর ভিতরে চলুন।

রক্ত ঝরেছে রমনার পীচঢালা কালো পথে, শহীদ হয়েছেন ওরা মাতৃভাষার জন্য। কিন্তু ওদের সেই রক্ত যেন আগুনে ধাঁধিয়ে দিল এদেশের মানুষের রক্তকে; চেতনার চিতা হল বহ্নিমান। রক্ত দেবার সেই তো সূত্রপাত। সেদিনের সেই রক্তের অক্ষরে একদিন একটি দেশের সম্ভাবনার বীজ উপ্ত হয়েছিল। সেই দেশের নামটিই বাংলাদেশ।

**খোন্দকার আলী আশরাফ**